বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রণীত রাষ্ট্রীয় নীতি: বর্ণনা ও বিশ্লেষণ।

রাকিবা সুলতানা রত্না*

Abstract

During the liberation war of 1971, our women played significant roles. Training camps were set up adjacent to the Indian border where women received training with men as a part of their preparation to fight against Pakistani army. They also served as combatant, informant, nurse, weapon smuggler and so on. For playing these roles they even had to face trauma, physical debilitation, displacement, widowhood and mass rape. If we look into the history of the world, rape is an inevitable part of battle as if it is a commonly used weapon of war. The role of women is mostly ignored, denied and misconstrued in our mainstream history. After the independence, they had to face the burden of confronting scars while attempting to reconstruct their livelihood. In this circumstances, Bangabandhu came with the light of hope to them. He awarded the title of "Birangona" or "War Heroine" who were raped during the war of independence. This paper will delineate the role of Bangabandhu in recognition, rehabilitation and promotion of the War Heroines.

ভূমিকা:

১৯৭১ সালে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধ বাঙালির শত বছরের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবী অধ্যায়। বাঙালি যুগে যুগে সংগ্রাম করেছে। লক্ষাধিক শহীদের আত্মবলিদান দেশমাতৃকার জন্য হাসিমুখে বীরত্বের সাথে সংগ্রাম আর আত্মোৎসর্গের এক উজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উত্তরসূরী এই বাঙালি জাতি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমির প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে নারীর উল্লেখযোগ্য অবদান। বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন অস্ত্রহাতে আবার বহু সংখ্যক নারী নির্যাতিতা হয়েছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নারী সমাজে, পরিবারে, দেশে, শরণার্থী শিবিরে, যুদ্ধক্ষেত্রে, বাংকারে, বন্দিশিবিরে উপস্থিত ছিল। এই সকল নারী যেমন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আবার তেমনই নির্মমভাবে নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাদের "বীরাঙ্গনা' উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করেছেন এবং সমাজে যথাযথ পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছিলেন। নয় মাসের যুদ্ধে ধর্ষণ, অপহরণ এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি ছিল বাঙালি নারীদের অপমানের শুধুমাত্র প্রথম পর্ব। স্বাধীনতা লাভের পর যে পর্বটি সামনে আসে সেটা ছিল ভয়াবহ। দেশ স্বাধীনের পরই গণহারে ধর্ষণের বিষয়টি একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেয়

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

যেটা শুধু মানবিক নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বটে। যখন যুদ্ধ চলছিল তখন প্রধান আকাঙ্খা ছিল বেঁচে থাকা। যেকোনো গণহত্যা, ব্যক্তি হত্যা, বন্ধু পরিজনের হত্যার খবর এর মাঝখানে বেঁচে থাকাই ছিল অনেক বড় কিছু। ধর্ষণের ঘটনা কে হত্যার চেয়ে অন্তত ভালো বলে বিবেচনা করেছিল অনেকে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার দিন থেকেই দেখা গেল বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি অংশ মানসিকভাবে ও পাশাপাশি শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত। ধর্ষিতা নারীদের সাথে তাদের পরিবার ও সরাসরি বিপর্যস্ত ছিল। "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য নারীকে অত্যাচার, ধর্ষণ এবং হত্যা করা হয়েছে। সঠিক সংখ্যা নিয়ে যদিও অনেকের মধ্যে সংশয় রয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়েছে ধর্ষিতার সংখ্যা ২ লক্ষ, মার্কিন গবেষক সুসান ব্রাউনমিলারের মতে এই সংখ্যা চার লক্ষ। এসব নারীদের একটি বিরাট অংশ গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। ধারণা করা হয় যে, বিপুল সংখ্যক গর্ভপাতের পাশাপাশি তাদের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল ২৫০০০ যুদ্ধশিশু"।১ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সকল নির্যাতিতা নারীদের উদ্ধার করা হয়। তাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় অবস্থাই ছিল বিপর্যস্ত। পাশাপাশি তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সবকিছু মিলিয়ে নির্যাতিতা নারীদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতা দিয়ে উক্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রনীত রাষ্ট্রীয় নীতি : বর্ণনা ও বিশ্লেষণ"। গবেষণা প্রবন্ধটিতে তথ্য ও উপাত্তের জন্য প্রধানত মাধ্যমিক বা গৌণ উৎস এর সহায়তা নেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থপাঠ ও বিশ্লেষণ, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধটিতে, ১৯৭১ সালে নির্যাতিত নারীদের দুঃখ-কষ্ট এবং দেশ স্বাধীন হবার পর তাদের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। নির্যাতিতা নারীদের প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অসীম মমতা, তাদের সম্মানিত করা এবং যথাযথভাবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যুদ্ধ ও নারী: তাত্ত্বিক কাঠামো

মুক্তিযুদ্ধকালীন নয়মাসে সারা পূর্ববঙ্গে অসংখ্য বাঙালি বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও স্বজনহারা নিঃস্বে পরিণত হতে হয়েছে। এই অসংখ্য মানুষের মধ্যে ৪ লক্ষ (মতান্তরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার, ড. জিওফ্রে ডেভিসের মতে এই সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে) নারী বর্বর পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং বিহারিগণ কর্তৃক বলাৎকার-ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। যাঁদের কেউ কেউ পরে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই সংখ্যাধিক্য এটা প্রমাণ করে যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একাত্তরের স্বাধীনতা আনয়নে বাঙালি নারীকে চরম বীভৎসতার শিকার হতে হয়েছে। ডা. এম. এ হাসান তার গবেষণায় ৪২টি জেলার ৮৫টি থানায় মাঠ পর্যায়ে গবেষণা চালিয়ে ২৬৭ জনের সাক্ষের ভিত্তিতে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা পেয়েছেন দু'লাখ দু' হাজার পাঁচশ সাতাশ জন। এর মধ্যে মুসলমান-৫৬,৫০%, হিন্দু-৪১,৪৪%, খ্রিস্টান ও অন্যান্য- ২.০৬%। এই সকল নারী দেশের অভ্যন্তরে নির্যাতিত হয়েছেন। এছাড়াও শরনার্থীদের মধ্যে নির্যাতিত হয়েছেন এক লাখ একত্রিশ হাজার দু'শ পঞ্চাশ জন।

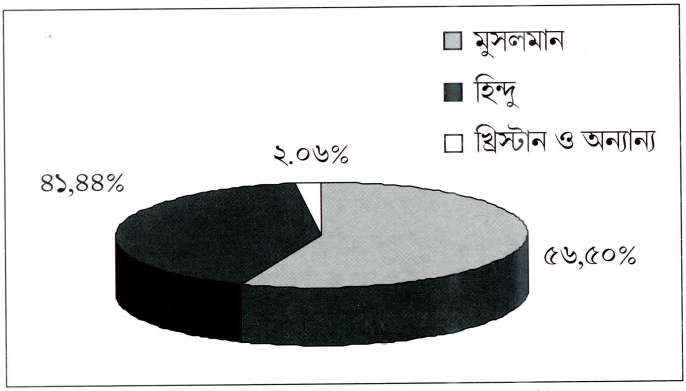

ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক ১৯৭১ এর নারী নির্যাতনের চিত্র

৪ লক্ষ নারীর ধর্ষণের শিকারে পরিণত হওয়া নিঃসন্দেহে বাঙালিদের জন্য অত্যন্ত বেদনাকর একটি ঘটনা। এত রক্তদানও স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট হয়নি, উৎসর্গ করতে হয়েছে লাখো নারীদের সম্ভ্রম। আমরা পারিনি এই বীভৎসতার হাত থেকে তাদেরকে বাঁচাতে। যিনি বেঁচেছেন, তিনি নিজের চেষ্টায়ই সেটা করেছেন। যাঁদের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার কৌশল ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের পরিণত হতে হয়েছে ভোগের সামগ্রীতে। কেউ কেউ সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছেন। যেমন চট্টগ্রামের জয়ন্তী পালিত রত্না এবং বাসন্তী রাণী। নিপীড়িত এইসব নারীর সবাই প্রত্যক্ষ যোদ্ধা ছিলেন না। কিন্তু তবু দেশের স্বাধীনতা আনয়নে এঁদের অবদানকে খাটো করে দেখবার কোন অবকাশ নেই। এ যাবৎকালে প্রণীত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অধিকাংশ গবেষকগণ নারীর এই শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ হিসেবে দেখাতে চাননি অথবা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।২

গবেষণার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য কিছু তাত্ত্বিক বিষয় জানা আবশ্যক। গবেষণার এই বিষয়বস্তুটি বিশ্লেষনের জন্য নারীবাদী তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে নারীবাদ, যুদ্ধ ও নারী নির্যাতন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

আলোচ্য গবেষণা কর্মে বিভিন্ন চলক যথা- যুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ ও নারী নির্যাতন চলক বা উপাদান সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞা বিধৃত হলো।

কার্যকর সংজ্ঞায়ন

যুদ্ধ

যুদ্ধ হচ্ছে একটি সংঘবদ্ধ এবং সম্প্রসারিত দ্বন্দ যা কোন রাষ্ট্রীয় কারক অথবা অরাষ্ট্রীয় কারক দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। গোটা বিশ্বব্যাপী যেখানে যুদ্ধ, দাঙ্গা, সংঘর্ষ হয়েছে সেখানে গণহত্যা ও নারী নির্যাতন হয়েছে অর্থাৎ যুদ্ধের উপর ভিত্তি করেই এইসকল অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। যুদ্ধের বৈশিষ্ট হচ্ছে অতিমাত্রায় আক্রমন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, মানুষের দৈহিক ও মানসিক দুঃখকষ্ট সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক বিনাশ। যুদ্ধ হচ্ছে একটি পরিকল্পিত এবং সুদূর প্রসারী সশস্ত্র সংঘর্ষ যা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত হয়। মোট কথা বলা যায় যুদ্ধ হচ্ছে রাজনৈতিক আক্রমন অথবা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। যুদ্ধের

অনুপস্থিতিকে শান্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়। "বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'যুদ্ধ' শব্দের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। New English Dictionary অনুসারে, যুদ্ধ হল "বিভিন্ন জাতি, রাষ্ট্র বা শাসকবর্গের মধ্যে অথবা একই দেশ বা রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে পরিচালিত শত্রুতামূলক সংঘর্ষ; কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে কিংবা রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত কোন বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার।"৩ Encyclopedia Britanica শীর্ষক বিশ্বকোষে বলা হয়: "পরস্পর-বিরোধী নীতি অনুসরণ করছে এবং একে অপরের উপর এর নীতি চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে এমন দু'জন মানুষের মধ্যে সংগঠিত শক্তির ব্যবহারের নামই যুদ্ধ।"৪ কুইন্স রাইটের মতে, 'সমসাময়িক আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধ বলতে দুই বা ততোধিক জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষকে বুঝায়, যাদের প্রত্যেকেই নিজকে সার্বভৌম ও আইনগতভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের, সাথে সমান মর্যাদার অধিকারী বলে দাবী করে।'৫ বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। "প্রত্যেক রাষ্টেরই নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হবার অধিকার রয়েছে- এটা আধুনিক সার্বভৌম রাষ্টের দাবীতে পরিণত হয়েছে।"৬ আর এ অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হলে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করাই রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক পৃথক পৃথক ভাবে বল প্রয়োগ করার চেয়ে অধিকতর কাম্য হবে কিন্তু এই ধারণা যতই যুক্তিভিত্তিক হোক না কেন, কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র এর যুদ্ধ করার অধিকার যে অদূর ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করবে এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৭১ সালের পূর্বেই। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এই সকল আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধের বীজ রোপিত হয়। গবেষনার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে হলে মুক্তিযুদ্ধ কি, সেটা জানা আবশ্যক। যখন কোন দেশের আপামর জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা নিজ দেশের সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শোষিত, অত্যাচারিত এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তখন নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাকে মুক্তিযুদ্ধ বলা যেতে পারে।৭

ঐতিহাসিক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের মতে, "মুক্তিযুদ্ধ আমরা করেছি একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য। লড়াই করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু এখানে আরও একটি কথা এসেছে, সেটা হলো 'মুক্তি'র কথা। বঙ্গবন্ধু কিন্তু প্রথমে মুক্তির কথা বলেছেন, তারপর বলেছেন 'স্বাধীনতার' কথা। ৭ মার্চের ভাষণে একটি বাক্যের মধ্যে তিনি এ শব্দ দুটো উচ্চারণ করেছেন। 'স্বাধীনতা' একটি খুব মাইক্রো কনসেপ্টের কথা। 'মুক্তির' তাৎপর্য অনেক ব্যাপক, অনেক বিশাল।৮

স্বাধীনতাযুদ্ধ

স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এবং মাতৃভূমি দখলদার বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ যে যুদ্ধ তাকেই স্বাধীনতাযুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মার্চ-ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধ এমনি এক যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ বাঙালির জীবনের এক শ্রেষ্ঠতম অর্জন। তবে একথা অনস্বীকার্য ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত এই যুদ্ধ শুধু

স্বাধীনতা নয়, বরং মুক্তির জন্যও ছিলো। "তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে স্বাধীনতার লক্ষ্য তাৎক্ষনিক আর মুক্তির লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী। অর্ন্তনিহিত প্রণোদনার বিচারে যুদ্ধটি ছিল মুক্তির জন্য। মুক্তিযুদ্ধ বললে যে ব্যাপক ও আমূল পরিবর্তনের কথা উঠে আসে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তা প্রাসঙ্গিক নয়। অবশ্য এটাও অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই মুক্তির পথ সুগম হতে পারে। আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে এর প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু দীর্ঘ তেইশ বছরের সংগ্রাম বা এই সংগ্রামপূর্ব সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমি এবং ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালির যে ভূমিকাটি স্পষ্ট-তার লক্ষ্য শুধু একটি স্বাধীন মাতৃভূমিতেই সীমিত হতে পারে না; বরং সেই স্বাধীনতার মাধ্যমে বাঙালি বিশাল এবং একই সঙ্গে বহুমাত্রিক অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলো"।৯

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ না স্বাধীনতা যুদ্ধ কোন প্রত্যয়টি অধিকতর যুক্তিযুক্ত সে প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, "মুক্তিযুদ্ধকে অনেকে বলেন স্বাধীনতাযুদ্ধ। আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে শব্দ দুটি সমার্থক মনে হলেও তফাৎ আছে প্রত্যয় দু'টিতে। তফাৎটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ কারণে যে, শেযোক্ত শব্দটি সরকারিভাবে ব্যবহার করা শুরু হয় সামরিক শাসনামলে, গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনে নয়। সে-কারণে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি প্রাক-১৯৭১ প্রজন্মের কাছে যতটা ব্যঞ্জনাময়, স্বাধীনতাযুদ্ধ ততটা নয়। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি ব্যাপক, অর্থ। অন্যদিকে স্বাধীনতার বিষয়টি সংকীর্ণ, অর্থ। মুক্তিযুদ্ধ বলতে বুঝায় (বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে) বাঙালির সার্বিক মুক্তি, সব অর্থে"।১০

সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের আলোকে বলা যায় যে, বর্তমান গবেষণায় স্বাধীনতাযুদ্ধ বলতে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের একটি চরমপর্বে স্বাধীন-স্বার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম বোঝানো হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধ

যুদ্ধাপরাধ হচ্ছে কোন যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত চলাকালীন সময়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক বেসরকারি জণগনের বিরুদ্ধে সংগঠিত, সমর্থিত নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত অপরাধ কর্মকান্ডসমূহ। যুদ্ধ এবং যুদ্ধাপরাধ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। ১৯৭১ এর নারী নির্যাতন ছিল একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধাপরাধ। তাই গবেষণা বিশ্লেষণের সুবিধার্থে যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইন অনুসারে যুদ্ধকালীন সংঘাতের সময় বেসরকারী জনগণকে খুন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, কারাগারে অন্তরীন ব্যক্তিকে হত্যা, নগর, বন্দর, হাসপাতাল কোন ধরনের সামরিক উস্কানি ছাড়াই ধ্বংস প্রভৃতি যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ কর্তৃক সংঘঠিত গণহত্যা ও নারী নির্যাতন বিশ্বের অন্যতম যদ্ধাপরাধের একটি। War Crime (যুদ্ধাপরাধ) যুদ্ধে লিপ্ত কোন সৈনিক কর্তৃক বিবেক বর্জিত কোন অপরাধমূলক কার্য করাকে যুদ্ধাপরাধ বলে। আর্ন্তজাতিক আইনে War Crime বা 'যুদ্ধাপরাধ' বলতে কোন যুদ্ধমান রাষ্ট্রের সৈনিক কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত এমন কতগুলো বিবেক বর্জিত অপরাধজনক কার্য সংঘটন করাকে বুঝায়, যে সকল কার্যের জন্য তারা যুদ্ধ বিষয়ক আইন লংঘনকারী হিসাবে দন্ডিত হতে পারে। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ অধ্যাপক ওপেনহাম যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অপরাধের কার্যকে ৪টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন:

- সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য কর্তৃক যুদ্ধের স্বীকৃত ও প্রচলিত নিয়ম লংঘন করা।
- সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নহেন এমন কোন বে-সামরিক ব্যক্তি কর্তৃক অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে সংঘটিত অবৈধ কার্যকলাপ।
- গুপ্তচর বৃত্তি ও যুদ্ধকালীন দেশদ্রোহিতার অপরাধ।
- লুটপাট বা লুণ্ঠন বিষয়ক কার্যকলাপ।

অধ্যাপক লাউটারপ্যাক্ট যুদ্ধাপরাধ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, "The term War Crimes relate to those acts which would be condemned by the common conscience of mankind by reason of their brutality in humanity or wanton disregard of the right of property unrelated to the reasonable military necessity.'[১১]

সর্বোপরি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ছাড়াও যদি বেসরকারি ব্যক্তিরাও যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে বৈরিতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত বা ব্যাপৃত হয়, তবে তারাও যুদ্ধাপরাধীর অর্ন্তভুক্ত হবে। আর্ন্তজাতিক আইনের লেখক ওপেন হ্যামের মতে যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহার, আহত বা সমর্পিত সৈন্যদের হত্যা, মৃতদেহের অবমাননা, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার, বেসামরিক নাগরিকদের আক্রমণ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জাদুঘর ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন প্রভৃতি স্থানে বোমাবর্ষণ যুদ্ধাপরাধ বলে পরিগণিত। অন্য কথায় কোন ব্যক্তি কর্তৃক যুদ্ধ আইন তথা আর্ন্তজাতিক মানবিক আইন (International Humanitarian Law) লংঘন। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বড় বড় যুদ্ধের অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে যুদ্ধাপরাধ ধারণাটি দ্বারা শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধও যুদ্ধাপরাধের আওতায় নিয়ে আসা হয়। ফলশ্রুতিতে বিজিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও অভিযুক্ত হতে পারেন এবং হয়েছেনও।

যুদ্ধাপরাধ ও নারী নির্যাতন

যুদ্ধাপরাধের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ হচ্ছে নারী নির্যাতন। তাই গবেষণা সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য যুদ্ধাপরাধ ও নারী নির্যাতনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। নারী নির্যাতন ও জেন্ডার বৈষম্য উন্নত ও উন্নয়নশীল নির্বিশেষে সকল ধরনের সমাজেই বিদ্যমান। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, কর্মক্ষেত্র সর্বত্রই নারীরা নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। নারী নির্যাতন নারী ক্ষমতায়নের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। তাই নারী নির্যাতন বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে বহুল আলোচিত ইস্যু। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীরা বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার। "আগ্রাসী যুদ্ধে ব্যাপক মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় 'পরিকল্পিত য্দ্ধাস্ত্র' হিসেবে ধর্ষণ-কে। বিবিসি-র সাংবাদিক মিজ লরা স্মিথ-স্পার্ক, ৮ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে এক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তার কলমে যুদ্ধে বিপন্ন মানবতার বর্বর চিত্র ফুটে উঠেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নতুন এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সামরিক আগ্রাসনের যুদ্ধ ক্ষেত্র প্রলম্বিত হয়েছে, 'নারীর শরীর ও যুদ্ধক্ষেত্র'! ধর্ষণ বা যৌন হয়রানি এখন আর শুধু যুদ্ধের উপজাত বা বাই প্রোডাক্ট বিষয় নয় বরং এসব ব্যবহৃত হয় পরিকল্পিত সামরিক রণকৌশল হিসেবে।"[১২]

"গত দু'শ বছরের যুদ্ধগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যেখানেই জাতিগত বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা য্দ্ধু ও ভায়োলেন্সের কারণ হিসেবে কাজ করেছে, সেখানেই নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো ব্যাপক হারে সংঘটিত হয়েছে। প্রতিটি প্রতিশোধ যুদ্ধ ও প্রতিহিংসা পূর্ণ আঘাত এর সাথে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিষয়টি ওতপ্রতোভাবে জড়িত।"[১৩]

"আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় যুদ্ধের কৌশল হিসেবে যৌনসন্ত্রাসের ব্যবহারকে বিবেচনা করা হয় অপরাধ হিসেবে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, সামরিক প্রধান এবং রাষ্ট্রের উঁচু স্তরের কর্মকর্তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। রোম সন্ধির ভিত্তিতে প্রণীত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট নির্দিষ্ট করে বিবৃত করে যে, এ ধরনের সন্ত্রাস মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং একটি যুদ্ধাপরাধ।"১৪

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও শিশুসহ বঞ্চিতদের জন্য সমান অধিকারের কথা বলা হলেও নারী-পুরুষের সমান অধিকারের প্রতিফলন সমাজে খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। সমাজের সকল ক্ষেত্রেই নারীরা চরম অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার। নারীদের নির্যাতিত হবার ঘটনা শহর, গ্রাম নির্বিশেষে সর্বত্র বিরাজমান। ঘরে-বাইরে সকল ক্ষেত্রেই নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ১৯৭১-এ সংগঠিত নারী নির্যাতন ও গণহত্যা একটি যুদ্ধাপরাধ। যেই যুদ্ধাপরাধের বিচার এখনো প্রক্রিয়াধীন।

১৯৭১ এ নারী নির্যাতনের ধরণ

১৯৭১ এ পাকিস্তানি সৈনিকরা বাঙালী নারীদের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে তার ভয়াবহতা অনেক। ডাঃ এম.এ হাসান তার যুদ্ধ ও নারী গ্রন্থে নারী নির্যাতন এর ধরণকে কয়েকটি ভাগে বিশ্লেষণ করেছেন যা একটি সারনির মাধ্যমে তুলে ধরা হল:

সারণি:১.১: ১৯৭১ এ নারী নির্যাতনের ধরণ

১৯৭১	স্থান	নারী নির্যাতনের ধরণ
স্পট রেপ	বিভিন্ন শহর, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, হিন্দু সম্প্রদায়, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়।	মেয়েদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া। মেয়েদেরকে তাদের বাড়িতে নির্যাতন করা। পুরুষ সদস্যকে হত্যা করে নারী সদস্যকে ধর্ষণ।
স্পট গণধর্ষণ	মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি যেখানে আঁচ পেয়েছে সেখানেই হামলা চালিয়েছে।	পুরুষদের বন্দি করে, অনেক নারীদের একত্রিত করে গণধর্ষণ। গণধর্ষণে ৮-১০০ জন সৈনিকের অংশগ্রহণ।
সেনাঘাটি ও ক্যাম্পে বন্দি নারীদের ধর্ষণ	বাড়ি ঘর, যাত্রী ছাউনি, রেলস্টেশন জাহাজ ঘাট, রেল, বাস প্রভৃতি যানবাহন।	মেয়েদেরকে অপহরণ করে ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন।
যৌনদাসী	সারাদেশে বিভিন্ন স্থান থেকে অপহরণ	শহর গ্রামের তরুণী নারীদের বন্দি করে নিজেদের ক্যাম্পে ও বাঙ্কারে যৌন দাসীতে পরিণত করা।

উৎস: হাসান, ডা. এম. এ ২০০২, যুদ্ধ ও নারী, ঢাকা, ওয়ার ক্রাইম এ- ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, গ্রন্থটির সহায়তায় সরণিটি তৈরি করা হয়েছে।

নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ:

১৯৭১ এর যুদ্ধে নির্যাতিতা নারীদের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিচে তুলে ধরা হল

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বীরাঙ্গণা উপাধি প্রদান

১৯৭১ এর যুদ্ধে নির্যাতিতা নারীদের সম্মানিত করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সমাজে তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। "১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাবনা জেলার নগরবাড়ির উত্তরে বসন্তপুর গ্রামে মুজিব বাধ নির্মাণের কার্যক্রম উদ্বোধন করতে গিয়াছিলাম। পাবনার কোন জনসভায় এত মানুষ আগে কখনও হয়নি। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার প্রাক্কালে দেখা গেল একদিকে খানিকটা হৈ চৈ হচ্ছে। কয়েকজন মহিলা বঙ্গবন্ধুর কাছে আসতে চাচ্ছেন কিন্তু তাদের বাধা দেয়া হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিলেন তাদের আসতে দিতে। তারা ছুটে এসে বঙ্গবন্ধু সমীপে লুটিয়ে পড়লেন। একজন জানালেন, তার খুব সুখের সংসার ছিল। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী তাকে লাঞ্চিত করে। তার স্বামী এখন তাকে সংসারে নিতে চাচ্ছেন না। আশে পাশের মানুষও টিটকারি দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শুনলেন। সবশেষে বঙ্গবন্ধু উঠলেন বক্তৃতা দিতে। প্রথমেই তিনি বললেন, "আজ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতিতা মহিলারা সাধারণ মহিলা নয়। তারা এখন থেকে বীরাঙ্গনা খেতাবে ভূষিত। কেননা দেশের জন্য তাঁরা ইজ্জত দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে তাদের অবদানে কোন অংশে কম নয়, বরং কয়েক ধাপ উপরে। যা আপনারা সবই জানেন। বুঝিয়ে বলতে হবে না। তাই তাদের বীরাঙ্গনা মর্যাদা দিতে হবে এবং তাদের যথারীতি সম্মান দেখাতে হবে। আর সেই স্বামী বা পিতার উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে, আপনারাও ধন্য। কেন না এ ধরনের ত্যাগী ও মহৎ স্ত্রীর স্বামী বা মেয়ের পিতা হয়েছেন।" অধিকাংশ বর্ণনায় আছে ওই দিন থেকে নির্যাতিতা মহিলারা "বীরাঙ্গনা" অভিধায় ভূষিত হন।"১৫

"বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরেছিলেন ১০ জানুয়ারী। আর সিরাজগঞ্জের সভা করেছিলেন ২৬ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু এর আগেই বাংলাদেশ সরকার লাঞ্ছিতাদের "বীরাঙ্গনা" উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাব নেয় এবং সংবাদপত্রও শব্দটি ব্যবহার শুরু করে। ৩ জানুয়ারি ১৯৭২ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় সরকরি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষা জাহানারা করিমের সভপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রস্তাব নেয়া হয় এই বলে যে, "পাক বাহিনী এবং তার সমর্থকদের অত্যাচারে আমাদের বোনেরা মায়েরা যারা নির্যাতিতা হয়েছেন, তাদের সরকার কর্তৃক "বীরাঙ্গনা" আখ্যা দান করার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে এবং সমাজে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে পুনপ্রতিষ্ঠায় আশু দাবি ও জানানো হয়।"১৬

অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশ স্বাধীন হবার পরপরই নির্যাতিতা নারীদের "বীরাঙ্গনা" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে ২৬ জানুয়ারি সভায় নিজ মুখে এই নির্যাতিতা নারীদের "বীরাঙ্গনা" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন এবং তাদের কল্যাণের স্বার্থে কিছু নীতি গ্রহন করেন। যা সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

সারণি-১.২: বীরাঙ্গণাদের কল্যাণে গৃহিত রাষ্ট্রীয় নীতি

নির্যাতিতা নারীদের বীরাঙ্গণা উপাধিতে ভূষিত করেন।
১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসন ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ১০% কোটা ব্যবস্থা চালু করেন।
অবরুদ্ধ দেশে ধর্ষিত নারীদের ক্ষেত্রে জানুয়ারী, ১৯৭২ থেকে অক্টোবর ১৯৭২ পর্যন্ত অ্যাবর্শন আইন প্রযোজ্য করেন।
The Bangladesh Abandoned Children (Special Provision) Order of 1972 আইন করেন যুদ্ধ শিশুদের দত্তকায়নের জন্য।
১৯৭২ সালে বীরাঙ্গণা নারীদের কল্যাণে একটি সরকারী বোর্ড গঠন করেন।

উৎস: মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, বীরাঙ্গনা, ১৯৭১, ঢাকা, সুবর্ণ। গ্রন্থটির সহায়তায় সারণিটি তৈরি করা হয়েছে।

নির্যাতিতা নারীদের উদ্ধার

দেশ স্বাধীন হবার পর নির্যাতিতা নারীদেরকে বিভিন্ন বাংকার, সেনা ক্যাম্প থেকে ভারতীয় মিত্র বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা উদ্ধার করে। "আবার অনেককে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে পাকিস্তান এবং ভারত চলে যাওয়ার পথ থেকে পরিবার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নওসাবা শরীফা, ডা. শরীফা খাতুন ও নীলিমা ইব্রাহিম গিয়ে উদ্ধার করেন।"[১৭]

১৯৭১ এ যুদ্ধে নির্যাতিতা শেফালীকে উদ্ধার করা হয় বাংকার থেকে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র ও উলঙ্গ অবস্থায় ছিল শেফালী। ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সদস্য যোগীন্দর সিং তার মাথার পবিত্র শিরস্ত্রান খুলে শেফার অপবিত্র দেহটাকে সযত্নে ঢেকে দিয়েছিল। অন্যান্য মেয়েদেরকে আশপাশ থেকে লুঙ্গী ও শার্ট জোগার করে দেয়া হয়েছিল।"[১৮]

"এরকম অবস্থা ছিল অধিকাংশ সেনানিবাস, বাংকার ও নির্যাতন কেন্দ্রগুলির। যেখানে সকল নির্যাতিতা মেয়েদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায়। অথবা শুধুমাত্র লুঙ্গী পরা অবস্থায় পাওয়া যায় মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী তাদেরকে বস্ত্র দিয়ে শরীর ঢেকে উদ্ধার করে। নির্যাতিতা রীনাকে ভারতীয় বাহিনীর এক সদস্য অর্ধউলঙ্গ এবং অর্ধমৃত অবস্থায় টেনে তোলে দেশ স্বাধীন হবার পর নিজ নিজ দায়িত্বে নির্যাতিতা নারীদের বাড়ি চলে যেতে বলা হয়। অনেকে লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই দৌড়ে বেরিয়ে যায়। রিনাসহ ৩০ জন কুমিল্লা সেনানিবাসে রয়ে যায়। সমাজের ভয়ে তারা পাকিস্তানিদের সাথে দেশ ত্যাগ করার প্রত্যাশায়। পরবর্তীতে রীনাকে তার ভাই উদ্ধার করে ভারতীয় মিলিটারী বিগ্রেডিয়ার ভার্মার সহায়তায় নীলিমা ইব্রাহিমের সহায়তায়।"[১৯]

এভাবে সারাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্প, বাংকার, সেনানিবাস থেকে অর্ধমৃত, মানসিক বিকারগ্রস্থ, উলঙ্গ অবস্থায় নারীদের উদ্ধার করে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সদস্যগন। "এসব নির্যাতিতা ও নারীদের শারীরিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ। তাদের গায়ে ঘা হয়ে গিয়েছিল এবং দীর্ঘদিন গোসল না করা, পরিস্কার কাপড় না পরা এর কারণে চামড়ায় ও গুড়ি গুড়ি উকুন হয়ে গিয়েছিল। মাথায় ধুলো বালি ভর্তি হয়ে চুল জট বেধে ছিল।"[২০]

"উদ্ধার করা মেয়েদের বিরামহীন প্রহারে দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিল মেয়েদের কারো মুখের সম্মুখের দিকে দাঁত ছিল না, ঠোঁটের দুদিকের মাংস কামড়ে, টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে মেয়েদের আঙ্গুল হাতের তালু, ভেঙ্গে, থেতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এই রকম বিভৎস অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা মেয়েদের উদ্ধার করে। ফেনীর কাছে ভারতীয় সৈন্যরা যখন পাকিস্তানি সেনাদের ঘাটি অবরোধ করেছিল পাকিস্তানি সেনারা তখন বাঙালি মেয়েদের বিবস্ত্র অবস্থায় মাটির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। যে সকল মেয়েদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল, তাদের কারো স্তন পাওয়া যায় নি, যোনিপথ ক্ষত-বিক্ষত এবং পিছনের মাংস কাটা ছিল। যোনিপথে লোহার রড কিংবা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। যুবতী মেয়েদের যোনিপথের এবং পিছনের মাংস যেন ধারালো চাকু দিয়ে কেটে এসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।"২১

তবে উদ্ধারকৃত নারীর প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় নি। যে সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সদস্যগণ এইসব নারীদের উদ্ধার করেছিল তারাও ছিল বয়সে তরুণ। এই তরুণ যুবকগণ নির্যাতিতা নারীদের উলঙ্গ অবস্থায় উদ্ধার করেছিল। কিন্তু তাদের প্রতি কোনরূপ কুদৃষ্টিপাত করেনি বরং তাদের লজ্জা ঢেকে বস্ত্র দিয়ে তাদের উদ্ধার করেছে। আসলে এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

বীরাঙ্গনাদের বিষয়ে গৃহীত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধ কালে ৪,০০,০০০ ধর্ষিতা নারীকে বীরাঙ্গনা নামে প্রশংসিত করে তাদের প্রতি একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করার জন্য ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ একটা নীতি গ্রহণ করে। বিয়ের মাধ্যমে পুনঃগ্রহণ এবং সামাজিক ভাবে পরিত্যাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করার প্রয়োজন এবং জনমানুষের কাছে সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণের জন্য এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় একটা নতুন শ্রেণি। সাহায্য ও পুনর্বাসন, গর্ভপাত ক্লিনিক, মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া, যুদ্ধাক্রান্ত প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধে ধর্ষিত মেয়েদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়ার সুবিধাসহ সারা দেশে পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় সাহায্য ও পুনর্বাসন বোর্ড।

সারণি-১.৩: পুনর্বাসন বোর্ড যে বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে

নির্যাতিতা নারীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।
নির্যাতিতা নারীদের কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করেছে।
নির্যাতিতা নারীদের বিবাহের ব্যবস্থা করেছে।
যুদ্ধ শিশুদের দত্তকায়নের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

উৎস: মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, বীরাঙ্গনা, ১৯৭১, ঢাকা, সুবর্ণ। গ্রন্থটির সহায়তায় সারণিটি তৈরি করা হয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা ও গর্ভপাত

পাকিস্তানি সৈন্যরা ব্যাপক ধর্ষণ চালিয়েছে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও কম বয়সী মেয়েদের ওপর। "অসংখ্য সূত্র থেকে ঘটনা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ সরকার তৎকালে

দাবি করেছিল ৭০,০০০ এর বেশী নারী এসময় ধর্ষণের ফলে গর্ভবর্তী হয়ে পড়েছে। তবে মার্কিন ও ব্রিটিশ শৈল্য চিকিৎসকগণ গর্ভপাত এর কাজ চালিয়েছিলেন। এদের মতে নিজ উদ্যোগে গর্ভপাত করানোর সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০ থেকে ১,৭০,০০০। যদিও সরকারি হিসাবও ড. ডেভিসের দেয়া হিসাবের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ কন্যাকে কলকাতায় গর্ভপাত বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু লজ্জা তীব্র ঘৃণা এবং বিকল্প পন্থায় ঘাটতির ফলে গ্রামীণ জনপদের সমাধানটি ছিল ভীতিকর এবং অযৌক্তিক। লন্ডন ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যাবরশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের ড. জেফরি ডেভিস বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের প্রত্যেক অঞ্চলে কয়েক মাস কাজ করেছে। ডেভিস নিরূপণ করে দেখতে পান যে, পাঁচ হাজার মেয়ে বিভিন্ন গ্রামীণ পদ্ধতিতে ও নানা রকম চিকিৎসাগত জটিলতাসহ গর্ভপাত করিয়েছে। সন্তান দওকায়ন ও গর্ভপাত বাছাই করা এই দুটো পথগুলোর মধ্যে গর্ভপাতই অধিক কাম্য হয়ে ওঠে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নারী পুনর্বাসন সংস্থার সহযোগিতায় প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড ঢাকা এবং এর আশেপাশের এলাকায় অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ মোকাবেলায় সতেরটি ক্লিনিক স্থাপন করে। তথ্য পাওয়া যায় যে প্রথম মাসে শুধু ঢাকা ক্লিনিক একাই প্রায় একশরও বেশি গর্ভপাত করে।"২২

নির্যাতিতা নারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা

ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ড প্যারেন্টহুড আবিষ্কার করে যে নির্যাতিতা নারীদের স্ত্রীরোগ সংক্রমণের মাত্রা ব্যাপক। একজন অস্ট্রেলিয় চিকিৎসক নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন "পরীক্ষা করে প্রায় প্রতিটি ধর্ষিতারই যৌনরোগ পাওয়া গেছে।"২৩ ড. ডেভিস এক প্রতিবেদনে বলেছিলেন, "দখলদার আমলে পাকিস্তান সেনা কর্তৃক ধর্ষিত বাংলাদেশের মহিলাদের একটা বিরাট অংশ বন্ধ্যাত্ব রোগের সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি আরও জানান, ৯ মাসে পাক বাহিনীদের দ্বারা ধর্ষিতা চার লাখ মহিলার বেশির ভাগই সিফিলিস অথবা গনোরিয়া কিংবা উভয় রোগের শিকার হয়েছে। তাদের অধিকাংশ ভ্রূণ হত্যাজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এরা বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারেন কিংবা বাকি জীবন ভর বারবার রোগে ভুগতে পারেন। অনেকে গ্রামীণ ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত করিয়েছেন। ফলে অনেক শারীরিক জটিলতাও রয়ে গেছে। অনেক সংখ্যক তরুণী যৌন মিলনের উপযোগী না হওয়ায় তাদের অবস্থা আরও খারাপ।"২৪ অধিকাংশ ধর্ষিতা নারী সুচিকিৎসা পাননি। যারা পরিত্যাজ্য হয়েছেন তাদের বেঁচে থাকা ছিল মুশকিল। এই সকল নারীদের কাউন্সিলিং হয় নি। অধিকাংশই রোগাক্রান্ত অবস্থায় ভুগেছেন। স্বাধীনতার পরপর ডাক্তারদের উচিত ছিল ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের স্বেচ্ছায় সুচিকিৎসা দেওয়া কিন্তু তারা তা দেননি, দিতে চাননি আইনের অজুহাত দেখিয়ে।২৫

পাকিস্তানিদের অত্যাচারের মাত্রা এতটাই পাশবিক ছিল যে, কারো কারো যৌনাঙ্গ ও পায়ুপথ একীভূত হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসার দ্বারা তাদের সারিয়ে তোলা চেষ্টা করা হয়। নির্যাতিতা নারীদের মানসিক অবস্থাও ছিল খারাপ। নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে যারা চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন তাদের সবাইকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থা কি?" প্রত্যেকে এক বাক্যে বলেছেন, "অবস্থা খুব খারাপ" বা মরে যেতে ইচ্ছা করে।" ধর্ষিত হওয়ার আত্মগ্লানি থেকে কেউই মুক্তি পায়নি।২৬

"দেশ স্বাধীন হবার পর অনেকে নির্যাতনের কারণে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ চিৎকার করে কাঁদত, কেউ বোকার মতো কেউ হিস্টিরিয়া রোগীর মতে হেসেই

চলত। খুলনার ফাতেমা নির্যাতনের কারণে পাগল হয়ে যায় পাড়ার ছেলেরা তাকে পাগলি বলে ডাকে। পাকিস্তানি সৈন্য ফাতিমার পরনের লুঙ্গি দিয়ে চুলের ঝুঁটি বেঁধে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে পাখার সঙ্গে লটকে দিয়ে সুইচ অন করে দিয়েছিল। এর পর থেকে তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর তার বিয়ে হয় এবং স্বামীর সহায়তায় কলকাতায় চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু মাথায় আঘাত ও মানষিক নির্যাতনের কারণে এক পর্যায়ে সে অর্ধপাগল হয়ে যায়।"২৭ পাইক গাছার নির্যাতিতা গুরুদাসী নির্যাতন শিকার হয়ে স্বামী সন্তান হারিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এবং খুলনার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন।২৮

আত্মহত্যা

দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক নারী মৃত্যুবরণ করে, অনেক নারীকে পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্যাতনের পর হত্যা করে, অনেকে নির্যাতন সইতে না পেরে নিজের পরনের শাড়ি বা মাথার চুল গলায় পেচিয়ে আত্মহত্যা করে। "ড. জেফরি ডেভিস বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়েকমাস কাজ করেছেন, তিনি জানিয়েছিলেন, জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সে সব মহিলা আত্মহত্যা করেন তাদের আত্মীয়স্বজন তা জানাননি। কারণ যদি তদন্ত হয়, তিনি তার ভ্রমণের সময়ে অসংখ্য আত্মহত্যা এবং সদ্যজাত শিশুহত্যার কথা শুনছেন। ইদুরের ওষুধ খেয়ে এবং পানিতে ডোবা ছিল আত্মহত্যার সহজলভ্য পথ।"২৯

"বন্দী থাকা অবস্থায় হতভাগা নারীদের যখনই শাড়ি পড়তে দেওয়া হয়েছে তখনই তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আত্মহত্যা করেছেন। অনেকে বুকে পাথর বেধে পুলের ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। যারা প্রাণে বেঁচে গেছেন তাদের মধ্যে হাজার হাজার মহিলা তাদের পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে তারা পরবর্তীতে আত্মহত্যা করেছেন। অনেক ধর্ষিতাকে হত্যা করা হয়েছে। শরনার্থী হিসেবে যারা ভারতে যাওয়ার পথে ধর্ষিত হয়েছেন তাদের অনেকে আর ফেরেননি। তাদের কোন খোঁজও পাওয়া যায়নি।"৩০

নির্যাতিতা হবার পর সমাজ ও পরিবার কর্তৃক পরিত্যাজ্য হয়েছে আবার অনেকের আত্মীয় পরিজন সবাইকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করেছে। দাড়ানের কোন জায়গা না পেয়ে আত্মহত্যার মাধ্যমে তারা মুক্তির একটাই পথ খুঁজে নিয়েছিলেন।

সরকারী উদ্দ্যোগে নির্যাতিতাদের বিয়ের ব্যবস্থা

"যুদ্ধে যে সমস্ত নারীর ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল, তাদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের রক্ষা করতে না পারা জাতির জন্য এক অসহায় লজ্জা। নির্যাতিতা নারীদের নির্যাতনের কথা যতদূর সম্ভব গোপন রেখে তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংসারে, সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি অনেক জরুরি ছিল। তাদের বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র ও সরকার এগিয়ে আসে। নির্যাতিতা নারীদের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে নিলে সম্ভাব্য বরদেরকে অর্থ-সাহায্যের মাধ্যমে উৎসাহ দিতে শুরু করে পুনর্বাসন কেন্দ্র। যুদ্ধবিদ্ধস্ত পরিবেশে ওই অর্থ সাহায্যের বিষয়টা ছিল খুবই উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়। 'অর্থের বিনিময়ে' নির্যাতিতা নারীদের বিয়ে করার জন্য অনেক ছেলেই আবেদনপত্র জমা দিয়েছিল"৩১

"অনেক মুক্তিযোদ্ধা তাদের প্রেমিকাকে বিয়ে করেছিলেন, অনেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে নির্যাতিতাকে বিয়ে করেছিলেন। অনেকের বিয়ে হয়েছিল ধর্ষণের কথা গোপন

রেখে। পরবর্তীকালে ধর্ষণের কথা জানাজানি হবার পর তাদের লাঞ্ছনার সম্মুখিন হতে হয়েছে। স্বামী পরিত্যাক্ত হয়েছেন।"৩২

১৯৭২ সালের সংবাদপত্রের কিছু প্রতিবেদনে নির্যাতিতাদের বিয়ের কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অনেকে নির্যাতিতাদের জীবন সঙ্গিনী করতে আগ্রহী। প্রতিবেদক বেবী মওদুদ জানিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ ফেরত অনেকেই বীরাঙ্গনাদের গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সেই সময় এ নিয়ে কাজ করছিল। পরিষদ এ রকম অনেক চিঠি পাচ্ছিলেন।

একজন পত্র লেখক জানিয়েছেন, "তিনি লাঞ্ছিতা মেয়েদের মধ্যে একজন এম এ শ্রেণির মেয়েকে বিয়ে করে সুখী সংসার গড়তে প্রস্তুত আছেন। আরেকজন লিখেছেন, সংসারে তার একান্ত আপনজন বলে কেউ নেই। তিনি একজন সঙ্গী চান তার সঙ্গী হোক না লাঞ্ছিত হোক না অবাঞ্ছিতা। তিনি তাকে মনের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন।"৩৩

একজন অধ্যাপকও জানিয়েছেন, "তিনি চান খান সেনাদের অত্যাচারের শিকার একজন মহিলাকে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে। বাংলাদেশের বাইরে থেকেও প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকেও অনেকে নির্যাতিতা নারীর মধ্যে কাউকে বিয়ের আগ্রহ দেখিয়ে চিঠি লিখেছেন।"৩৪

"নির্যাতিতাদের অনেকে গ্রহণ করেছিল তবে সে সংখ্যাটি খুব বেশি ছিল না। যে পরিবারে কেউ ধর্ষিত হয়েছেন বা নির্যতিত হয়েছেন সেটি গোপন রাখতে চেয়েছেন। গ্রামে সেটি সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। শহরে অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে। অনেকে গোপন রেখে বিয়ে দিতে পেরেছেন। কেউ আজ পর্যন্ত তা জানেনি। অনেকে জেনে শুনে বিয়ে করেছেন। অনেককে স্বামী পরিত্যাগ করেছেন, অনেকে আর সমাজে ফিরতে চান নি। বিদেশী এনজিওদের সাহায্যে চলে গেছেন।"৩৫

ধর্ষিতা নারীদের বৈবাহিক পরিসংখ্যান

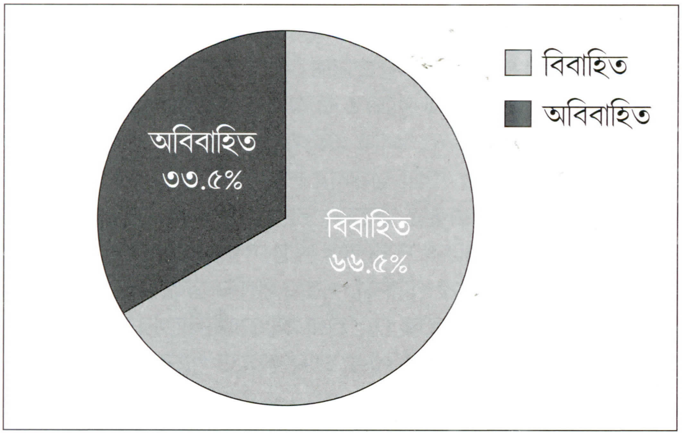

উৎস: হাসান, ডা. এম এ ২০০২, যুদ্ধ ও নারী, ঢাকা, ওয়্যার ক্রাইম এন্ড ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি।

সুসান তার বইতে লিখেছেন, সরকারি কর্মচারিরা বলেছিলেন, বিবাহ ইচ্ছুকদের দাবি বাড়ছে সেই দাবি লাল টুকটুকে টয়োটা গাড়ি থেকে- কবিতা প্রকাশ পর্যন্ত। অনেকে নির্যাতিতা আবার পুরুষের উপস্থিতিও সহ্য করতে পারছেন না। সুসানের ভাষায় "The demands of the man

have ranged from the latest model of Japanese car, painted red, to the publication of unpublished poems.' a government official bitterly complained. Another stabling block perhaps unexpected by Bangladeshis was the attitude of the raped women. 'many won't be able to let rated the presence of among for sometime. The same official admitted."৩৬

সীমিত সম্পদ নিয়েই বঙ্গবন্ধুর সরকার সমস্যা মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। সুসান ব্রাউনমিলার তার গ্রন্থে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগ ও কার্যক্রমকে heroic moving force হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

জনপ্রতিনিধি ও সিভিল সমাজের ভূমিকা

জনপ্রতিনিধি বা সিভিল সমাজের সচেতন নাগরিকরা বীরাঙ্গনাদের নিয়ে সব সময়ই সচেতন ছিলেন। "আওয়ামীলীগ নেতা ও সংসদ সদস্য বদুরুন্নেসা আহমদ যখন কলকাতায় ছিলেন তখনই উদ্বাস্তু শিবির গুলিতে নিয়মিত যেতেন । লাঞ্ছিতাদের সহায়তা দেবার চেষ্টা করতেন। কয়েকজন সমাজকর্মী ইস্কাটনে একটি কেন্দ্রের মতো করেছিলেন যেখানে লাঞ্ছিতাদের সীমিত আকারে চিকিৎসা আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইষ্ট পাকিস্তান গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনের নেত্রীরাও খোঁজ খবর রাখার চেষ্টা করছিলেন।"৩৭

"৪ জানুয়ারি সমাজের ১৯ জন ব্যক্তিত্ব যাদের মধ্যে ছিলেন কুদরতে খুদা, সৈয়দ মুস্তফা আলী, কবীর চৌধুরী, সুফিয়া কামাল আহমদ শরীফ প্রমুখ এক বিবৃতিতে সবাইকে বিশেষ করে যুব সমাজের প্রতি আহ্বানে জানান লাঞ্ছিত বোনদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তারা বলেন "যাদের অপমৃত্যু হয়েছে তারা আমাদের সমস্যা নন। যারা বেঁচে আছেন তাদের জীবন যেন ব্যর্থ না হয়। সে জন্য স্বাধীন দেশের শিক্ষা প্রবৃদ্ধ সংস্কৃতিবান ও উদার তরুণ নাগরিকদের মুনষ্যত্বের কাছে এবং তাদের সংবেদনশীলতার কাছে আজ আমাদের এই আকুল আবেদন।"৩৮

আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা বদরুননেছা আহমেদ ও এক বিবৃতিতে বীরাঙ্গনাদের খোজ খবর নেয়ার জন্য সবার প্রতি আবেদন জানান যেতে তাদের জন্য কিছু করা যায়। বিবৃতিতে তিনি বলেন "বাংলার মা বোনেরা যারা নির্যাতিত বা অভিভাবকহীন হয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তার জন্য সঠিক প্রয়োজন। আমি এই সূত্রে আবেদন করছি। যারা পাক বাহিনীর বা আলবদর ও রাজাকার বাহিনীর বর্বর হামলার শিকার হয়েছেন বা হতে দেখেছেন অথবা যাঁরা সঠিক খবর এবং বর্তমান পরিস্থিতি জানেন তারা নিজ নিজ স্থানের আওয়ামীলীগ মহিলা সম্পাদিকার কাছে বিবৃতি দিয়ে সঠিক তথ্য যত শীঘ্র সম্ভব জানাবেন এবং তার সকল কপি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের মহিলা সম্পাদিকা, পুরান পল্টন ঢাকা এই ঠিকানায় পাঠাবেন এবং ঢাকায় মহিলাদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা আওয়ামীলীগের সদর দপ্তর পুরানা পল্টনে এসে মহিলা কর্মীদের কাছে সরাসরি তথ্য পরিবেশন করতে পারে।"৩৯

তৎকালীন প্রগতিশীল নারী নেত্রী এবং সমাজকর্মীগণ সর্বাত্মক ভাবে চেষ্টা চালান বীরাঙ্গনা দের অনুসন্ধান করার জন্য এবং তারা আন্তরিকভাবে বীরাঙ্গনা নারীদের সমাজে পুন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান।

কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা গঠন

"বাঙালি নারীদের চেষ্টায় ৭ জানুয়ারি গঠিত হয় 'কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা' সুফিয়া কামালকে সভাপতি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শাহেরা আহমেদকে সম্পাদক এবং সংসদ সদস্য তসলিমা আবেদকে কোষাধ্যক্ষ করে এই সংস্থা গঠিত হয়। লাঞ্ছিতাদের জন্য তারা যে আশ্রয়গৃহ করেছিলেন তার মেট্রন নিযুক্ত হন হাজেরা খাতুন।

সংস্থায় প্রতিনিধিরা এরপর স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কামরুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি তাদের সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ইস্কাটনে ২০নং ও ৮৮ নং দুটি বাড়ি বরাদ্দ দেন যেখানে আশ্রয়গৃহ খোলা হয়।"৪০

"বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি ফিরে আসেন।তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেন। বদরুননেসা আহমেদ ও নুরজাহান মুরশেদকে তিনি দায়িত্ব দেন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ণে। সেখানে শুধু বীরাঙ্গনা নয় যারা পরিত্যাক্ত, আশ্রয়হীন, বিধবা, অসহায় তাদেরও যেন পুনর্বাসন করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে সরকার ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। এটি ছিল সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত একটি স্বায়ত্বশাসিত বোর্ড। এ বোর্ডের সভাপতি করা হয় বিচারপতি কে এম সোবহান কে। বোর্ডে বিচারপতি, লেখিকা জনপ্রতিনিধি ছাড়াও ছিলেন সদ্য বিধবারা। সরকার থেকে ১০ কোটি টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের। ঐ সময়ের প্রেক্ষিতে যা ছিল বিরাট অংকের টাকা জনাব আব্দুল আওয়ালকে কর্মসূচীর প্রধান করা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সৈয়দ জাহাঙ্গীর হায়দারকে প্রশাসনিক পরিচালক ও শহীদ এমপি মামুন মাহমুদের স্ত্রী মোশফেকা মাহমুদকে করা হয় ফিন্যান্স ডিরেক্টর।"৪১

"সুফিয়া কামাল ও অন্যান্যরা যে বোর্ড গঠন করেছিলেন এবং তার অধীন জেলায় জেলায় যে কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন তা হস্তান্তর করেন নতুন বোর্ডের কাছে। তবে ইস্কাটনের বাড়ি দুটি রেখে দেন তাদের গৃহীত কর্মসূচীর জন্য। তারাও বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান করছিলেন। এক প্রতিবেদন অনুসারে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তারা ৩০০ জন বীরাঙ্গনা এনেছিলেন। যাদের মধ্যে ৫০ জনকে ১৫ দিনে পরই পরিবারের আশ্রয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।" ৪২

বীরাঙ্গনাদের কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা

পুনর্বাসন বলতে বোঝায় আরাম, স্বস্তি বেশি কিছু নারী সংস্থাগুলো গৃহহীন পরিত্যাক্ত নারীদেরকে কর্মদক্ষ করে তোলার জন্য এগিয়ে আসে। হস্তশিল্প, শর্টহ্যান্ড, টাইপিং ছিল প্রথম পছন্দ। পুনর্বাসন বলতে আকাঙ্খিত দীর্ঘস্থায়ী লক্ষটির মধ্যে ছিল বিয়ে।৪৩

"একজন উপার্জনকারী মেয়ের বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে বেশি। তাই প্রশিক্ষণ প্রদান করে মেয়েদের উপার্জনক্ষম করার প্রয়াস নেয়া হয়েছিল। বোর্ড মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। বোর্ড মহিলাদের ক্যারিয়ার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট খোলে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল বাংলাদেশে প্রথম বেইলি রোডে তাহেরুন্নেসা আব্দুল্লাহর পরিচালনায় কাজ শুরু হয়। তাহেরুন্নেসা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন "আমি ডাইরেক্টর ট্রেনিং হিসেবে সেখানে যোগ দিই। আমাদের মেইন অফিস ছিল মোহাম্মদপুরে। ওখানে একটি ট্রেনিং সেন্টারও ছিল। আর বেইলি রোডে ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি ওমেন এর বিল্ডিং এ ক্যারিয়ার ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের চালু করা হয়। ওদের বাড়িটি হচ্ছে হোস্টেল। ওখানে আমরা এক তলাটা ভাড়া নিয়েছিলাম"৪৪

"এখানে বোর্ড সেক্রেটারিয়্যাল কোর্স শুরু করেছিল। আরেকটি ক্ষেত্র ছিল হাতের কাজ শেখান। সাভারে তারা একটি পোল্ট্রি খামার ও খুলেছিলেন। মোহাম্মদ পুরেও সেলাই ও কারুশিল্প তৈরীর প্রশিক্ষণ হতো।"৪৫

তাহেরুন্নেসা জানিয়েছেন "ওখানে যারা সেক্রেটারিয়েল কোর্সে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিল ওয়ার এফেকটেড উইমেন। যাদের স্বামী মারা গেছেন অথবা স্বামী নিখোঁজ এদের সংখ্যাই বেশি ছিল। এছাড়াও পাকিস্তান আর্মির শিবিরে অত্যাচারিত মহিলারাও ছিলেন। সেলাইয়ের ওপর একজনকে ট্রেনিং দিয়েছিলাম তার চারটে বাচ্চা। সে তাদের রেখে স্বামীর খোঁজ করতে বেরিয়েছিল। স্বামী বোধ হয় বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে ছিল। তার স্বামীর খোঁজ তো পায়নি। পথে আর্মিরা তাকে টেনে নিয়ে যায়। সে ট্রেনিং নিতে এসেছিল। আর এমন হিন্দু মেয়ে ছিল তার বয়স ছিল বড়জোর ২০-২২ বছর। সেও ছিল আর্মি ক্যাম্পে। সেও সেক্রেটারিয়াল ট্রেনিং নেয়। আরেকজন উচ্চ পদস্থ সরকারি অফিসারের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ট্রেনিং কমপ্লিট করে বিমানের লন্ডন ব্রাঞ্চে চাকরি নিয়েছিলেন। আরেকজন ছিলেন এক নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী। সে আইসিডিডিআরবিতে চাকরি নেয়।"৪৬

"তাহেরুন্নেসার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নেয়া কয়েকজন বীরাঙ্গনা নারীর কর্মসংস্থান এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এভাবে অনেক বীরাঙ্গনা নারী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাভাবিক জীবন গঠনে ফিরে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যখন বোর্ড গঠন করেন সিরাজগঞ্জের সোফিনা লোহানী ছিল সিরাজগঞ্জের কেন্দ্রের সাধারন সম্পাদক তিনি এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছিলেন, ১৯৭২ সালে তারা ৫০/৬০ জন বীরাঙ্গনাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। যারা নিশ্চুপে চিকিৎসা নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। আশ্রয় গৃহে ছিলেন ৩৬ জন যারা হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।"৪৭

"যারা বিধবা হয়েছিলেন তাদের জন্যও বঙ্গবন্ধু কর্মসংস্থানের চেষ্টা করেছিলেন ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের শহীদ এমপি শামসুল হকের স্ত্রী মাহমুদা হক চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে চাকরি চেয়েছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, বঙ্গবন্ধু বলেছিল, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মহিলাদের স্থান নেই। পরে বঙ্গবন্ধু অনুভব করেছিলেন, পাকিস্তানে যা ছিল তাতো বাংলাদেশে থাকবে না। এমন তো কথা নেই। তিনি মাহমুদাকে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করে বলেছিলেন, তুমি হবে রাষ্ট্রদূত। ১৯৯৬ সালে মাহমুদা ভুটানে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন।"৪৮

বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদার ও মহৎ হৃদয়ের একজন মহামানব। যিনি সারা জীবন জনকল্যানের ব্যায় করেছেন। তিনি নারীদের সবসময় সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং যুদ্ধে নির্যাতিত সকল নারীর পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের যথাযথ চেষ্টা করেছিলেন।

"১৯৭২ সালেই বঙ্গবন্ধু সকল সরকারি আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসন ও আধা স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে শতকরা ১০টি শূন্য পদে নির্যাতিতা মহিলা অথবা মুক্তিযুদ্ধে যাদের আত্মীয়-স্বজন মারা গেছে এমন সব মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার আদেশ দেন।"৪৯

"নিরাশ্রয় মহিলা পুনর্বাসন সমিতির প্রতিনিধি দল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাদেরকে এ আশ্বাস দেন যে, সরকার হতভাগ্য মহিলাদের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করবে।"৫০

"প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য আলাদা বরাদ্দ দেয় হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। কিন্তু সীমিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান করা সম্ভবও হয়নি। তিনি যুবকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন অসহায় নারীদের বিয়ের জন্য। বিচারপতি সোবহান বীরাঙ্গনাদের বিয়ের জন্য

একটি বিবাহ কেন্দ্র খোলার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তারা দশ জন মহিলার বিয়েও দিয়েছিলেন। এমনকি বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ও ক্লান্তিহীন ভাবে বীরাঙ্গনাদের জন্য কাজ করেছিলেন। অনেককে সংসারের জিনিসপত্র দিয়েও তিনি সাহায্য করেছিলেন।"৫১

"১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু এ কাজকে সংহত করার জন্য বোর্ডকে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে উন্নীত করেন। এতসব চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকেই সাহায্যের আওতার বাইরে ছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বা সরকারের প্রচেষ্টায় একটি নীরব সমাজ বিপ্লব সাধন করেছিলেন। নারীরা মুক্ত হয়েছিলেন প্রবল সামাজিক বাধাগ্রস্থ। ১০% কোটা নারীদের প্রভূত সাহায্য করেছিল। নারীদের জন্য কল্যানকর বিষয়গুলোর সূচনা করেছিল বঙ্গবন্ধু সরকার। ১৯৮৪ সালে নারী পুর্ণবাসন ও কল্যান ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক কোর্স এবং জাতীয় মহিলা উন্নয়ন একাডেমীকে একত্র করে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন করা হয়। ১৯৯০ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এখন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও করা হয়েছে যারা নারী উন্নয়নের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।"৫২ বঙ্গবন্ধু যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন আজ তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা

"পূনর্বাসন বোর্ড পুর্নোদ্যমে কাজ শুরু করে। এ কাজের জন্য নিবেদিত কর্মীরা ও বোর্ড পেয়েছিলেন। সংস্থার প্রথম কাজ ছিল বীরাঙ্গনাদের সম্পর্কে জরিপ করা ও তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা। বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সারা দেশে ২২টি সেবা সদন প্রতিষ্ঠা করা হয়। বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। এসব সেবামূলক কাজে প্রভূতভাবে সহায়তা করে মিশনারিজ অব চ্যারিটির সিস্টার মার্গারেট মেরি এবং ডা. জিওফ্রে ডেভিস এবং ওজাট অল গুলজ। পুনর্বাসন বোর্ডকে ধানমন্ডির ৩নং রোডে একটি বাড়ি বরাদ্দ করা হয়। সেখানে একটি বিশেষায়িত ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। ডাঃ ডেভিস এ কাজে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেন। সরকার কাজের আইনগত বাধা দূর করতে নির্দেশ দেন। ধর্ষিতা নারীদের একটি বিরাট অংশ অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। তাদের গর্ভের শিশুকে সমাজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে না। কাজেই অন্তঃসত্ত্বা নারীদের গর্ভপাতের বিষয়টি সামনে আসে। এক্ষেত্রে যারা অবরুদ্ধ দেশে ধর্ষিত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অ্যাবর্শন আইন প্রযোজ্য করা হয়।"৫৩

পাবনা শহরের উত্তর উপকণ্ঠে নুরপুরের ডাক বাংলা ভবনে স্থাপিত হয়েছিল পাবনা নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বীরাঙ্গণাদের জন্য সেবা সনদ এবং যুদ্ধ শিশুদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র বা এতিমখানা। বিশেষতঃ বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসা করার কারণে লোকমুখে সেই সেবা সদন পরিচিত হয়ে উঠেছিল বীরাঙ্গনা হাসপাতালরূপে।

পাবনা বীরাঙ্গনা হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে। পাবনার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের একজন চিকিৎসক এবং দেলোয়ারা নামের একজন নার্সের উপর দায়িত্ব বর্তায় হাসপাতালের সেবা সম্পর্কিত তথ্য যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে পৌছানোর।৫৪

"যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার অবর্তমানে কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ। দুজনে মিলে শহর শহরের উপকণ্ঠে গিয়ে বীরাঙ্গনাদের কাছে সেবা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানোর কাজ শুরু করে তারা। তাদের ওই আহ্বানে এবং লোকমুখে সংবাদ পেয়ে জানুয়ারী ১৯৭২ থেকেই প্রয়োজনীয় সেবা নেয়ার জন্য বীরাঙ্গনা হাসপাতালে ভর্তি হতে থাকে। এ সময়ে

বীরাঙ্গনা হাসপাতালে একজন বিদেশী চিকিৎসক আসে দেলোয়ারা যদিও তার নামে মনে করতে পারছেন না। ধারনা করা যায় তিনি ড. জেফারি ডেভিস। সেই বিদেশী চিকিৎসক সযত্নে নিপুন হাতে নিরাপদ ভাবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন দেলোয়ারা। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই দেলোয়ারার হাতে যুদ্ধ শিশুদের জন্ম হতে শুরু করে।"৫৫

"১৯৭২ সালের প্রথম কয়েক মাসে মোট ১৬০ জন গর্ভবতী বীরাঙ্গনা মেয়ে ভর্তি হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৯০ জন যুদ্ধ শিশুর জন্ম দেয়। বাকী ৬০ জন গর্ভপাত করায়। সেই বীরাঙ্গনা মেয়েদের বেশিরভাগের বয়স ছিল ১২ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে।"৫৬

সারণি-১.৪: একনজরে বীরাঙ্গণাদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম

১ম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় বীরাঙ্গণাদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়।
বিয়ের মাধ্যমে সমাজে পুনঃ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।
বীরাঙ্গণাকে বিয়ের পুরস্কার হিসেবে চাকুরী প্রদান করা হয়।
বীরাঙ্গণা নারীদের কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়া।
গর্ভপাতের জন্য ক্লিনিক স্থাপন করা হয়।
সেক্রেটারীয়াল কোর্স চালু করা হয়
সেলাই ও কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়
পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সাভারে একটি পোল্ট্রি ফার্ম করা হয়।

উৎস: মামুন, মুনতাসীর, ২০১৩, বীরাঙ্গনা, ১৯৭১, ঢাকা, সুবর্ণ ও হোসেন, সাজিদ ২০০৯, ৭১ এর যুদ্ধ শিশু, ঢাকা, সময় প্রকাশনা। গ্রন্থদ্বয়ের সহায়তায় সারণিটি তৈরি করা হয়েছে।

যুদ্ধ শিশুদের পুনর্বাসনে সরকারের গৃহীত নীতি

"ড: জেফারি ডেভিসের মতে পায় ২ লক্ষ নারী অন্ত:সত্ত্বা হয়েছিল। তবে এটা সহজেই অনুমেয় যে, যুদ্ধবিধস্ত পরিবেশে যুদ্ধ শিশুদের সংখ্যা নিরুপন করাটা ছিল কঠিন। ১৯৭২ সালে জন্মানো যুদ্ধ শিশুদের সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রনিধানকৃত সংখা সর্বনিম্ন ১০ হাজার এবং সবোর্চ্চ ২৫ হাজার। যারা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা সন্তান ত্যাগ করেছেন কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র এসব শিশু গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না। যুদ্ধ শিশুদের পুনর্বাসনের জন্যও বঙ্গবন্ধু সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করেন। জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল সোসাল সার্ভিসকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানান কিছু একটা করার জন্য। আই এস এস বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ও বাংলাদেশ সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন সাহয্যে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যার ফলে বহু যুদ্ধ শিশুকে বিদেশে দত্তকায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয় ফলে ১৯৭২ সালেই যুদ্ধ শিশুদের আশ্রয়নের জন্য একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ক্রমশ বর্ধনশীল অগণিত পরিত্যক্ত যুদ্ধ শিশুদের সঠিকভাবে দত্তকায়ন ও অভিভাবকত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির ১২৪ নম্বর আদেশ, বাংলাদেশ অ্যাবনডল চিলড্রেন স্পেশাল পভিশন ১৯৭২ (The Bangladesh Abandoned Children Special Provision order of 1972) জারি করা হয়। কিন্তু কয়েক বছর পরই এই আইনটিকে রহিত করা হয়। এবং আজও সেটা একই অবস্থায় রয়ে গেছে কারণটা ছিল কিছু কিছু শিশুদের

ক্ষেত্রে অপব্যবহার ও অত্যাচারের অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন সংবাদপত্রে। কিন্তু কোনো রকমের বিস্তারিত তদন্ত ছাড়াই ওই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।”৫৭

বঙ্গবন্ধু সরকার বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে এর পর বীরাঙ্গনাদের পথে বসতে হয়। সরকার কতৃক প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। ফলে পুনরায় তারা সমাজহীন আশ্রয়হীন অসহায় শ্রেণীতে পরিণত হয়।

যুদ্ধ শিশুদের পুনর্বাসনে এনজিও’র ভূমিকা

“যুদ্ধ শিশুদের পুনর্বাসন ও বীরাঙ্গনাদের কল্যানে কয়েকটি এনজিও চার্চ বা স্বেচ্ছা অভিভাবক প্রদানকরী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছিলেন সু কঠিন গুরুদায়িত্ব পালনে ১৯৭২ সালের ২১ শে জানুয়ারি মাদার তেরেসা বাংলাদেশে আসেন এবং একটি বাড়িতে অস্থায়ীভাবে চালু করে যুদ্ধ শিশুদের জন্য প্রথম আশ্রয়কেন্দ্র। বিভিন্ন জেলা থেকে যুদ্ধশিশু সংগ্রহ করেন। দুই বছর আট মাস ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করে বীরাঙ্গনাদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা প্রদান করেন।”৫৮

দত্তকায়নে আগ্রহী বিদেশী সংস্থাগুলো থেকে নার্সিংহোমগুলোর প্রতি অনুরোধ ছিল জন্মের পরে যেন কোন বাচ্চাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া না হয় বা অন্য কোনো ভাবে বিক্রি করে দেয়া না হয়। সরকার যুদ্ধ শিশুদের বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইন, সনদ, পাসপোর্ট, প্লেনের টিকেট সব কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের ভেতরে কোন মানুষই দত্তকায়নে এগিয়ে আসেনি। কাজেই সরকার বাধ্য হয়েই বিভিন্ন সেবা সংস্থাগুলোকে অনুমতি দেয় এবং পাসর্পোট ও প্রদান করে।স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশ হয়তো যুদ্ধকালীন অযাচিত গর্ভধারণকে আইনের সঠিক বিবেচনাতে নিয়েছিল নারীর সত্তা ও মাতৃত্বকে গর্ভপাত ও দত্তকায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগ করেছিল। অর্থাৎ জাতিগত পরিচয় গঠনের প্রেক্ষিতে সরকার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যকর নীতি গ্রহণ করেছিল, কিন্তু নারীর একান্ত প্রয়োজন ছিল গৌণ, ধর্মীয় সংস্থা, আন্তর্জাতিক দত্তকায়ন সংস্থা এবং ক্লিনিকগুলো রাষ্ট্র গঠনের একটি অবিচ্ছেদ স্তর হিসেবে কাজ করেছে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলো ও কার্যকর নীতি বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়ত রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কাজ করেছে নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক নারীকেই হয়ত তার সন্তান দিতে কষ্ট পেতে হয়েছিল।

সারণি-১.৫: স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন এন.জিও কার্যক্রমের তালিকা

সাল	এন.জি.ও’র নাম	কার্যক্রম
১৯৭১, ১৯৭২ ও পরবর্তী সময়ে	ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ডড প্যারেন্টহুড ফেডারেশন (লন্ডন)	নির্যাতিতদের চিকিৎসার ববস্থা করে
	মিশনারিজ ও চ্যারিটি	বিভিন্ন সেবামূলক কার্যাবলী
	ইষ্ট পাকিস্তান গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশন	চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও খোঁজখবর সংক্রান্ত কার্যাবলী
	রেডক্রস	মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিতা নারীদের সাহায্য ও সহায়তা
	করিতাস	নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনের সহায়তা করে।
	কেন্দ্রীয় মহিলা পুর্নাবসন সংস্থা	বীরাঙ্গণা, স্বামী ও পরিবার কর্তৃক পরিত্যাক্ত, আশ্রয়হীন, বিধবা, অসহায়দের পুনর্বাসন

উৎস: মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, বীরাঙ্গনা, ১৯৭১, ঢাকা, সুবর্ণ, ও হোসেন, সাজিদ ২০০৯, ৭১ এর যুদ্ধ শিশু, ঢাকা, সময় প্রকাশনা। গ্রন্থদ্বয়ের সহায়তায় সারনিটি তৈরি করা হয়েছে।

উপসংহার:

বীরাঙ্গনা নারীদের সম্মানিত এবং সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট কলো রাতে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালির সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং যার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে বীরঙ্গনা নারীদের উপর। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বিভিন্ন সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বীরাঙ্গনা নারীদের আবার পথে বসতে হয়। আশ্রয় কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সব বন্ধ হয়ে যায়। অনেকে একেবারে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় রাস্তায় এসে দাড়ায়। তাদের কেউ সমাজে নিন্দিত হবার ভয়ে নিজের পরিচয় গোপন রেখে মানুষের বাসায় কাজ করেছেন, কেউ ভিক্ষা বৃত্তিতে নেমেছেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর তারা ১৯৭১ এর মত আর একবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিরাজগঞ্জে আসেন। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে ৩৫ জন বীরাঙ্গনাকে মা বলে সম্বোধন করে এক সাথে মঞ্চে ওঠেন। সেই সম্মান ছাড়া বীরাঙ্গনাদের ভাগ্যে আর কোন সম্মান জোটেনি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সিরাজগঞ্জের পুনর্বাসন কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু কেবল রাষ্ট্রীয়ভাবেই নির্যাতিতা নারীদের পাশে দাড়ায়নি বরং তিনি ব্যাক্তিগত এবং পারিবারিক ভাবেও তিনি বীরাঙ্গনাদের পিতৃতুল্য ছিলেন। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবও স্নেহ ও মমতার সাথে বীরাঙ্গনাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিজ উদ্যোগে বীরাঙ্গনাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন এবং সফলভাবে ১০ জন বীরাঙ্গনা কন্যার বিয়ে দেন। ১৯৭৫ পরবর্তী কালে কোন সরকারই বীরাঙ্গনা নারীদের মর্যাদা রক্ষা বা পুনর্বাসনের কার্যক্রম বহাল রাখেনি। নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসন এবং ইতিবাচক গ্রহন যোগ্যতার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্দ্যোগের পাশাপাশি সামাজ একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান সময়ে বীরঙ্গনা নারীদের সর্ম্পকে সামাজিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও ৮০ এবং ৯০ দশকে সামাজিক পরিস্থিতি বীরঙ্গানাদের অনুকুলে ছিল না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বীরঙ্গনাদের সামাজিক মর্যাদা প্রদানে শিক্ষিত ও তরুন সমাজ ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বীরাঙ্গনা নারীদের "মুক্তিযোদ্ধা" স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৪ সালে ১০ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীরাঙ্গনা নারীদের "মুক্তিযোদ্ধা" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ জাতীয় সংসদে এই প্রস্তাব পাস হয়। এরপর থেকে ৬ জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধাপে ধাপে মোট ৪১৬ জন বীরাঙ্গনা নারীদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ করে। তারা মুক্তিযোদ্ধা ভাতাসহ সকল সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রায় ৫০০ জন বীরাঙ্গনাদের তালিকা নিয়ে কাজ করছেন এবং পর্যায়ক্রমে সবাইকে স্বীকৃতি দেয়া হবে বলে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রাণালয় ঘোষনা করে। বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এর মাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানের দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসুরী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বীরাঙ্গনাদের প্রাপ্ত সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, আইনপ্রণেতা, নারী এ্যাকটিভিস্ট, এনজিও সমূহের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। বীরঙ্গনার নারীদের সমাজে মর্যাদাপূর্ণ জীবন ফিরিয়ে দেয়ার পিছনে আরও একটি গ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হচ্ছে সমাজে সাধারন মানুষ। এ লক্ষ্যে সমাজের সাধারন মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন করা আবশ্যক।

তথ্যসূত্র

১. হোসেন, সাজিদ ২০০৯, একাত্তরের যুদ্ধ শিশু, ঢাকা,সময় প্রকাশক, পৃ: ৩৩।

২. কবীর, রোকেয়া ও মেহেদী, মুজিব ২০০৬, মুক্তিযুদ্ধে নারী, ঢাকা, আই. ই. ডি, পৃ: ১৬৯।

৩. ইসলাম, ড. সিরাজুল ১৯৭৫, আর্ন্তজাতিক রাজনীতি, ঢাকা, বুক সোসাইটি, পৃ: ১৮৪।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৪।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৪।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৫।

৭. মামুন, মুনতাসীর ও হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার ১৯৮৬, বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

৮. হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার ২০০০, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা: তত্ত্ব ও পদ্ধতি, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, পৃ: ৩৭।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭।

১০. মামুন, মুনতাসীর ২০০০, যে সব হত্যার বিচার হয়নি, ঢাকা, সময় প্রকাশক, পৃ: ১৩।

১১. আহসান, মো: শামীম, ২০০৬, কূটনীতি কোষ, ঢাকা, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, পৃ: ৬৫৮।

১২. হোসেন, সাজিদ ২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৬।

১৩. হাসান, ডা. এম এ ২০০২, যুদ্ধ ও নারী, ঢাকা, ওয়ার ক্রাইম এন্ড ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, পৃ: ০২।

১৪. হোসেন, সাজিদ ২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫।

১৫. নবাব, চৌধুরী আব্দুল বাকী ২০১১, বীরাঙ্গনা নাম যে ভাবে হলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ ডিসেম্বর।

১৬. সংবাদপত্র প্রতিবেদন ১৯৭২, দৈনিক আজাদ, ৪ জানুয়ারী।

১৭. ইব্রাহিম, নীলিমা ১৯৯৮, আমি বীরাঙ্গনা বলছি, ঢাকা, জাগৃতি প্রকাশনী, পৃ: ৮৫

১৮. ইব্রাহিম, নীলিমা ১৯৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০,৭১।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৬।

২১. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, বীরাঙ্গনা ১৯৭১, ঢাকা, সুবর্ন প্রকাশন, পৃ: ৪৯।

২২. হোসেন, সাজিদ ২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩।

২৪. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩।

২৫. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১-৪২।

২৬. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩।

২৭. ইব্রাহিম, নীলিমা ১৯৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৪।

২৮. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।

২৯. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩-৩৪।

৩০. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

৩১. হোসেন, সাজিদ ২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩-৪৪।
৩২. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।
৩৩. মওদুদ, বেবী ১৯৭২, দিকে দিকে আজ চলছে মানবতার ডাকে সাড়া দেয়ার পালা, দৈনিক আজাদ, ৯ ফেব্রুয়ারী
৩৪. সংবাদপত্র প্রতিবেদন ১৯৭২, দৈনিক আজাদ, ৯ ফেব্রুয়ারী।
৩৫. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২।
৩৬. Miller, Susan Brown 1975, Against Our will: men, women and rape, US, Simon and Schuster. PP: 83.
৩৭. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮।
৪০. Schulte, Mariance 2014, Liberating the women of 1971, The Daily Star, 08 December.
৪১. বাংলাদেশের নির্যাতিতা নারীদের অবিলম্বে সর্বপ্রকার সাহায্য পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন করেন ১৯৭২, দৈনিক আজাদ, ১২ ফেব্রুয়ারী।
৪২. মওদুদ, বেবী ১৯৭২, বীরাঙ্গানাদের অনুসন্ধান চলছে, দৈনিক আজাদ, ১০ ফেব্রুয়ারী।
৪৩. হোসেন, সাজিদ ২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪।
৪৪. আব্দুল্লাহ, তাহেরুন্নেসা ২০১০, সাক্ষাৎকার, বুলেটিন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মার্চ।
৪৫. Schulte, Mariance 2014, প্রাগুক্ত।
৪৬. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০-৫১।
৪৭. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১।
৪৮. Schulte, Mariance 2014, প্রাগুক্ত।
৪৯. সংবাদপত্র প্রতিবেদন ১৯৭২, দৈনিক আজাদ, ২৪ মার্চ।
৫০. সংবাদপত্র প্রতিবেদন ১৯৭২, দৈনিক আজাদ, ৩১ মার্চ।
৫১. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২।
৫২. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩।
৫৩. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯।
৫৪. হোসেন, সাজিদ ২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০।
৫৫. হোসেন, সাজিদ ২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২-৪৩।
৫৬. হোসেন, সাজিদ ২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪-২৫।
৫৭. মামুন, মুনতাসীর ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯।
৫৮. হোসেন, সাজিদ ২০০৯, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৯।